PRANT JON

the marginal people's organization...

উন্নয়নের আড়ালে কলাপাড়ার কান্না ঃ এক মানবিক দলিল

সেপ্টেম্বর ২০২৫

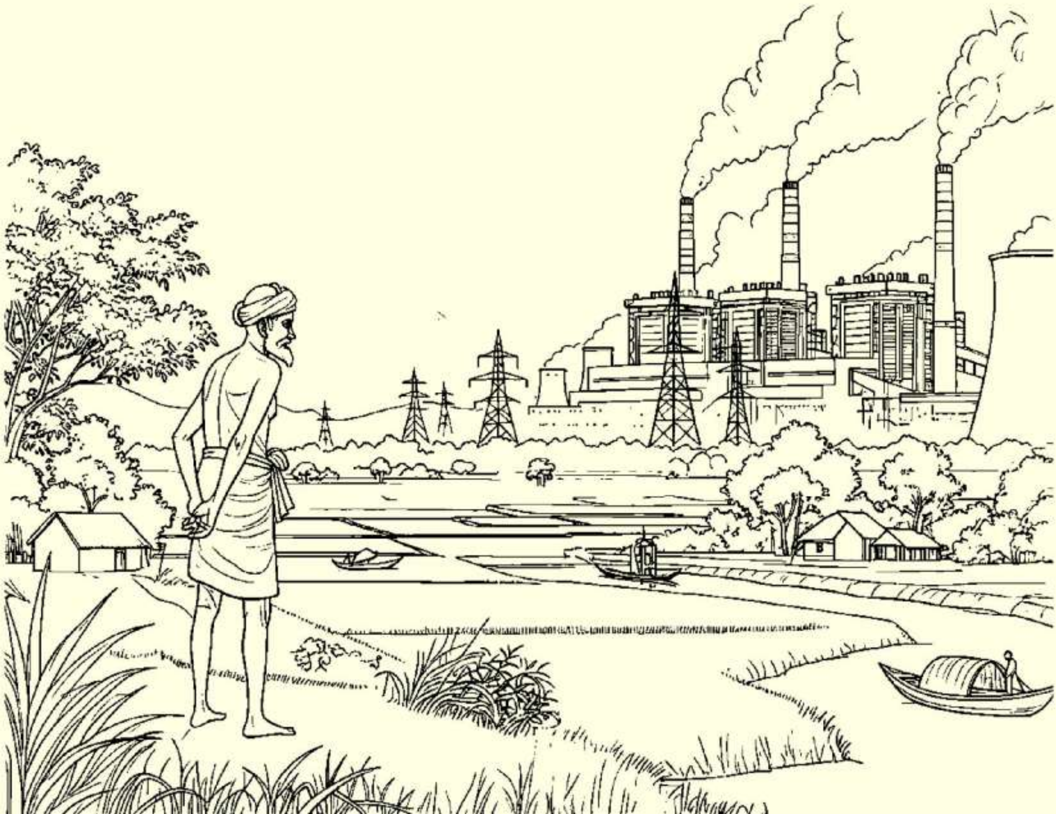

উন্নয়নের আড়ালে কলাপাড়ার কান্না ঃ এক মানবিক দলিল

প্রকাশক ঃ প্রান্তজন

প্রকাশকাল ঃ সেপ্টেম্বর ২০২৫

গ্রন্থস্বত্ব ঃ প্রান্তজন

সম্পাদনা পর্ষদ ঃ
মোঃ তৌহিদুল ইসলাম শাহাজাদা
মোঃ সাইফুল্লাহ মাহমুদ

কৃতজ্ঞতা ঃ
আজাদ আবুল কালাম
জাহিদুর রহমান
শুভংকর চক্রবর্তী
মোঃ মঈনুল ইসলাম সবুজ

প্রচ্ছদ ঃ অপূর্ব গৌতম

বর্ণবিন্যাস ঃ জয় কম্পিউটার

প্রান্তজন
কুলসুম প্যালেস (৯ম তলা), মীরা বাড়ি সড়ক, বটতলা, বরিশাল।
Email: prantojon.bd@gmail.com, Web: www.prantojon.org

ভূমিকা ঃ

পটুয়াখালীর কলাপাড়া একসময় পরিচিত ছিল সবুজে ঘেরা এক শান্ত জনপদ হিসেবে, যেখানে প্রকৃতি আর মানুষের জীবন ছিল অবিচ্ছেদ্য। দিগন্তজোড়া ফসলের মাঠ আর কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের অপার সৌন্দর্য এই অঞ্চলের সহজ সরল জীবনের প্রতিচ্ছবি ছিল। এখানকার মানুষ তাদের জীবিকা নির্বাহ করত কৃষি ও মৎস্য আহরণ করে। এক কথায়, প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকা এক সহজ জীবন ছিল তাদের।

কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সেই চিত্র পাল্টে গেছে। কলাপাড়া এখন আর শুধু একটি কৃষি ও মৎস্য নির্ভর অঞ্চল নয়; এটি এখন দেশের পাওয়ার হাব হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এই রূপান্তরের পিছনে রয়েছে মেগা-প্রকল্পগুলোর হাতছানি। পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা সমুদ্র বন্দর, পটুয়াখালী ১৩২০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিমিটেড, এবং অন্যান্য বড় বড় স্থাপনা। নিঃসন্দেহে এসব প্রকল্প দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। কিন্তু এই উন্নয়নের আড়ালে লুকিয়ে আছে স্থানীয় মানুষের অবর্ণনীয় ত্যাগ ও কষ্ট।

এই বইটি সেইসব মানুষের অকথিত গল্প নিয়ে লেখা, যাদের জীবন উন্নয়নের চাকার নিচে পিষ্ট হয়েছে। এটি কেবল ভূমি অধিগ্রহণের পরিসংখ্যান বা পরিবেশগত ক্ষতির বিবরণ নয়; এটি একটি মানবিক দলিল, যা ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের আবেগ, হতাশা এবং টিকে থাকার নিরন্তর সংগ্রামকে তুলে ধরে। এখানে আমরা দেখতে পাবো, কীভাবে একটি পরিবার তাদের ১৪ বছরের সঞ্চয় দিয়ে তৈরি করা স্বপ্নীল বাড়িটি হারিয়েছে, কীভাবে একজন কৃষক তার ফসলের জমি হারিয়ে বেকার হয়ে গেছে, এবং কীভাবে একটি অসহায় পরিবার মামলার জটিলতায় দিনের পর দিন দুর্ভোগ পোহাচ্ছে।

এই বইয়ের প্রতিটি পাতা কলাপাড়ার সেই মানুষগুলোর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। যাদের জন্য "উন্নয়ন" মানে কেবল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নয়, বরং ভূমিহীনতা, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ যাত্রা এবং অধিকার বঞ্চিত হওয়ার বেদনা। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, প্রকৃত উন্নয়ন কেবল অবকাঠামোগত নির্মাণে নয়, বরং তা মানুষের জীবন ও জীবিকা নিশ্চিত করার মধ্যে নিহিত।

আমরা আশা করি, এই বইটি কেবল কলাপাড়ার বাস্তবতাকে তুলে ধরবে না, বরং ভূমি অধিগ্রহণ এবং উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের অধিকার রক্ষায় একটি নতুন আলোচনার সূচনা করবে। এটি আমাদের সকলের জন্য একটি নীরব প্রশ্ন, উন্নয়ন কি মানুষের ত্যাগ ও কষ্টের বিনিময়ে হবে? নাকি উন্নয়ন এমন হওয়া উচিত যা সকলের জীবনকে আরও সহজ ও সুন্দর করে তুলবে ?

মোঃ তৌহিদুল ইসলাম শাহাজাদা
নির্বাহী পরিচালক, প্রান্তজন

সূচিপত্র

উন্নয়ন বনাম জীবন	– ০৫
উন্নয়নের যাঁতাকলে কৃষি ও কৃষকের স্বপ্ন	– ০৬
বিপন্ন ইলিশ	– ০৭
কৃষি হটিয়ে উন্নয়ন	– ০৮
কৃষক হায়দার আলীর কান্না	– ০৯
স্বপ্নের পুনর্বাসন, বাস্তবের জটাজাল	– ১০
উন্নয়ন নয়, এ যেন এক সর্বনাশা ফাঁদ	– ১১
উন্নয়নের এক নির্মম উপাখ্যান	– ১২
লোন্দা গ্রামের কান্না ঃ বাঁধহারা জীবনের গল্প	– ১৩
জীবনের স্রোতে ভাসমান ঃ রেশমা বেগমের অনিশ্চিত গল্প	– ১৪
উন্নয়নের আড়ালে লুকিয়ে থাকা কান্না	– ১৫
জমিদার থেকে ভূমিহীন	– ১৬
জীবনের বেড়াজালে অনিশ্চিত মিনারা বেগমের জীবন	– ১৭
দালালের যাঁতাকলে বন্দী	– ১৮
পায়রা তাপবিদ্যুৎ ঃ জমির লড়াই জীবনের দুর্ভোগ	– ১৯
স্বপ্নের ইটের দেয়াল ভেঙে	– ২০
হাওয়া বেগমের লড়াই ঃ উন্নয়নের শিকার এক জীবন	– ২১
এক কৃষক থেকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী	– ২২
উন্নয়নের আড়ালে চাপা পড়া জীবন	– ২৩
মামলার জালে হয়রানি ঃ কলাপাড়ার বাস্তুচ্যুত মানুষের গল্প	– ২৪

উন্নয়ন বনাম জীবন ঃ
কলাপাড়ার বাস্তুচ্যুত কৃষকদের কান্না

পটুয়াখালীর কলাপাড়া একসময় ছিল দেশের দক্ষিণ উপকূলের এক সবুজ প্রাণকেন্দ্র। উর্বর কৃষিভূমি, নদী-নালা আর প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে ভরা এই জনপদটি ছিল হাজারো কৃষকের জীবিকার আশ্রয়স্থল। এখানকার মানুষের জীবন আবর্তিত হতো ধানক্ষেতের সবুজ আর নদীর ইলিশকে ঘিরে। কিন্তু বর্তমানে, একের পর এক মেগা প্রকল্পের আগমনে কলাপাড়ার সেই চিরায়ত রূপ বদলে যাচ্ছে। 'উন্নয়ন' নামক এক অপ্রতিরোধ্য স্রোতধারা পুরনো জীবনধারাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে কৃষকের স্বপ্ন আর জীবনের গল্প চাপা পড়ছে কংক্রিটের নিচে।

> “কলাপাড়ার উর্বর মাটি ছেড়ে, বাস্তুচ্যুতির যন্ত্রনায় এখন দিন কাটছে শত শত কৃষকের। মেগা প্রকল্পের ঝলমলে আলোয় ঢাকা পড়ে গেছে তাদের হারানোর গল্প। এক সময়ের স্বনির্ভর কৃষক, যাদের জমিই ছিল জীবন, আজ তারা জীবিকা হারিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি।”

সালমা বেগমের গল্পটা অনেকেরই পরিচিত। ৪০ বছরের পুরনো ভিটামাটি ছেড়ে আজ তিনি আশ্রয়কেন্দ্রের বাসিন্দা। কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ১২ কাঠা বসতভিটা ও ফসলি জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ক্ষতিপূরণ বাবদ পাওয়া ১৭ লাখ টাকার মধ্যে ৩ লাখই গেছে দালালদের পকেটে। স্বামী আব্দুর রহমান কৃষি ছেড়ে মুদি দোকান চালাচ্ছেন, কিন্তু তাতে সেই জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য নেই।

চম্পা বেগমের কষ্ট আরেক ধরনের। বাবার দেওয়া ৪৫ শতাংশ জমিতে ঘর বেঁধে সুখেই ছিলেন। কিন্তু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নোটিশে সব বদলে গেল। ঘরের জন্য ক্ষতিপূরণ পাননি এমনকি আশ্রয়ও মেলেনি। নিরুপায় হয়ে রাস্তার পাশে সামান্য জমি কিনে কোনোমতে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিয়েছেন।

মুজিবুর রহমানের মতো অনেকেই আছেন, যাদের জীবনের মূলধন ছিল জমি। ২১.৭৩ একর জমি পায়রা বন্দরের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছে। কেবল ধান চাষ করেই বছরে পাঁচ লাখ টাকা আয় ছিল তার। কিন্তু এখন ক্ষতিপূরণ পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা, কারণ জমির মালিকানা নিয়ে আইনি জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে।

ফরিদ তালুকদারের পরিবারের ৪০ একর তিন ফসলি জমি এখন শুধুই স্মৃতি। সরকার থেকে ন্যায্য দাম পাওয়ার কথা থাকলেও দালালচক্র আর মামলার গ্যাঁড়াকলে আটকে আছে তাদের প্রাপ্য টাকা। বিকল্প আবাসনের প্রতিশ্রুতিরও কোনো খোঁজ নেই। এক সময়ের সমৃদ্ধ কৃষকের পরিবার আজ দিশাহীন। এই উন্নয়নের ঢেউয়ে তাদের জীবন বদলে গেছে, কিন্তু সে পরিবর্তন কোনো সুখ নিয়ে আসেনি, কেবলই রেখে গেছে হারানোর দীর্ঘশ্বাস।

উন্নয়নের যাঁতাকলে কৃষি ও কৃষকের স্বপ্ন

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের এক রূপসী জনপদ পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত কলাপাড়া উপজেলা। এর একদিকে যেমন রয়েছে বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ, তেমনি আরেক দিকে আছে সমুদ্রের বিশালতা। এখানকার সবুজ ধানক্ষেত, নারিকেল গাছের সারি আর প্রাকৃতিক বৈচিত্র মুগ্ধ করার মতো। তবে সম্প্রতি, এই অঞ্চলটি মেগা প্রকল্প গুলোর কারণে দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, যা উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশ এবং মানুষের জীবনেও নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসছে।

এই কলাপাড়ার মাটি এক সময় ছিল আনিছুর রহমানের জীবন। পশ্চিম সোনাতলা গ্রামের সেই উর্বর জমিতে বাপ-দাদার পেশা কৃষিকেই তিনি আঁকড়ে ধরেছিলেন। কিন্তু বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য তার কৃষি জমি অধিগ্রহণ করা হলো। সব স্বপ্ন ভেঙে গেল। এক সময়ের স্বাবলম্বী কৃষক আনিছুর এখন দেনার ভারে জর্জরিত হয়ে ভিটেমাটি ছেড়েছেন। স্ত্রী-মেয়েকে নিয়ে নতুন ঠিকানা খুঁজেছেন চট্টগ্রামে, যেখানে তিনি স্যানিটারি মিস্ত্রির কাজ করে দিন গুজরান করছেন।

আনিছুরের মতো আরেকজন খলিলুর রহমান। তিনিও চার বছর আগে কৃষিকাজ ছেড়েছেন। তার ভাষায়, "বিদ্যুৎ কেন্দ্র আসার পর থেকে ফলন কমে গেছে। ধানে চিটা ধরে, আর তাপমাত্রা এত বেড়ে গেছে যে চাষ করাই কঠিন।" তাই তিনিও এখন কলাপাড়া উপজেলা শহরে স্যানিটারি মিস্ত্রির কাজ কিংবা দিনমজুরি করে সংসার চালান।

> "শুধু প্রকল্প এলাকা নয়, পাশের গ্রামগুলোতেও পড়েছে এর প্রভাব। মেগা প্রকল্পের জন্য ড্রেজার দিয়ে বালু উত্তোলনের ফলে নোনা পানি আশপাশের আবাদি জমিতে প্রবেশ করছে। এতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। পুকুর ও মাছের ঘের নোনা পানিতে ডুবে যাচ্ছে।"

কৃষি বিভাগের তথ্য বলছে, ২০১৪ সালে কলাপাড়ায় চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল ৩৫ হাজার হেক্টর। ১০ বছরে তা কমে হয়েছে প্রায় ২৫ হাজার হেক্টর। উর্বর জমিতে একর প্রতি ১০০ থেকে ১২০ মণ ধান ফলতো, আর তরমুজের ফলন ছিল ৫ থেকে ৭ লাখ টাকার। আউশ, আমন, ডাল, মরিচ, সূর্যমুখী, গম, ভুট্টাসহ বিভিন্ন ফসল হতো। এখন সেখানে বছরে মাত্র একবার বা অনিয়মিত চাষ হয়।

কৃষি কর্মকর্তা মোহাম্মদ আরাফাত হোসেন জানান, ২০১৩ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত কলাপাড়ায় ধান উৎপাদন কমেছে ৩০ শতাংশ। উন্নয়ন কলাপাড়ার চেহারা বদলে দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এর নিচে চাপা পড়ে যাচ্ছে শত শত কৃষকের জীবিকা আর তাদের ফসলের মাঠ।

বিপন্ন ইলিশঃ কলাপাড়ার মেগা প্রকল্পের কবলে রামনাবাদ ও আন্ধারমানিক নদী

পটুয়াখালীর কলাপাড়া এক সময় ইলিশের অফুরন্ত ভান্ডার হিসেবে পরিচিত ছিল। আন্ধার মানিক, পায়রা, রামনাবাদ নদীগুলো ছিল বঙ্গোপসাগর থেকে আসা ইলিশের প্রধান প্রজনন ক্ষেত্র। এখানকার নদীগুলোর স্বচ্ছ পানি আর অনুকূল পরিবেশের কারণে ইলিশ এখানে অবাধে বিচরণ করত। জেলেরা প্রতিদিন প্রচুর ইলিশ ধরতেন, যা তাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উৎস ছিল। কিন্তু এখন সেই দৃশ্য বদলে গেছে। মেগা প্রকল্পের কারণে নদীর পানি দূষিত হচ্ছে, ইলিশের চলাচল বাধাগ্রস্থ হচ্ছে, এবং প্রজনন ক্ষেত্রগুলো হুমকির মুখে পড়েছে। কলাপাড়ার নদীগুলোতে ইলিশের আনাগোনা কমে যাওয়ায় জেলেদের জীবনে নেমে এসেছে গভীর হতাশা, যা একসময় ইলিশের স্বর্গরাজ্য হিসেবে পরিচিত এই জনপদের জন্য এক বিষন্ন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। পরিবেশপ্রেমীরা বলছেন, এই এলাকার অনন্য জীববৈচিত্র, যা ডলফিন, মাছরাঙা, লাল কাঁকড়া, এমনকি বন্য বাঘরোলকেও আশ্রয় দিত, তাও আজ ধ্বংসের মুখে।

কলাপাড়ার প্রবীণ জেলে মোহাম্মদ জালাল হোসেনের কথায় ফুটে ওঠে বর্তমান দুর্দশার চিত্র। তিনি জানান, "আগে দিনে ৮-১০ কেজি ইলিশ ধরা পড়তো। এখন ২-৩ কেজি পেলেই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি।" তার অভিযোগ, নদীর জল এখন দুর্গন্ধযুক্ত, আর মাছের সংখ্যাও কমে গেছে উল্লেখযোগ্য ভাবে।

> “বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সংকটের মূল কারণ হলো মেগা প্রকল্পের নির্মাণকাজ। প্রকল্পগুলো থেকে নির্গত শিল্প বর্জ্য এবং অপরিশোধিত গরম পানি সরাসরি নদীতে পড়ছে। এর ফলে ইলিশের প্রজনন এবং চলাচল বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। বঙ্গোপসাগর থেকে আসা ইলিশের মূল প্রবেশ পথগুলো এখন প্রায় অবরুদ্ধ। শুধু তাই নয়, অতিরিক্ত জাহাজ চলাচল নদীর স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্রকে বিঘ্নিত করছে।”

ইলিশ অত্যন্ত সংবেদনশীল মাছ। সামান্যতম দূষণও এর জীবনচক্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। কলাপাড়ায় গড়ে ওঠা বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ অন্যান্য অবকাঠামোর কারণে ইলিশের আকার ছোট হয়ে যাচ্ছে এবং তারা প্রজননের জন্য অন্য পথ বেছে নিচ্ছে। স্থানীয় জেলে এবং পরিবেশবিদদের শঙ্কা, এই দূষণ চলতে থাকলে অচিরেই কলাপাড়ার নদীগুলো ইলিশশূন্য হয়ে পড়বে, যার প্রভাব পড়বে দেশের সামগ্রিক ইলিশ উৎপাদনে এবং এক সময়ের ইলিশের রাজধানী শুধু গল্পেই থেকে যাবে।

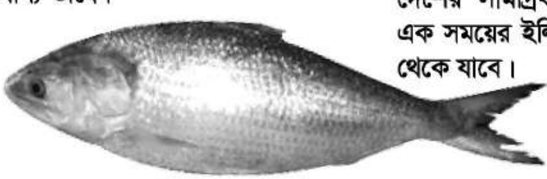

কৃষি হটিয়ে উন্নয়ন ঃ কলাপাড়ার হারানো ভূমি ও জীবন

এক সময় কলাপাড়া ছিল সবুজ কৃষিভূমি আর নদী-নালার এক উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। উপকূলীয় এই উপজেলায় বছরে তিনবার ফসল ফলত, আর নদীর ঢেউয়ে খেলত ইলিশের ঝাঁক। কিন্তু "এনার্জি হাব"-এর তকমা নিয়ে আসা একের পর এক মেগা প্রকল্প সেই চিত্রটাকেই পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছে। এখন সবুজ ধানক্ষেতের জায়গায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল বিশাল স্থাপনা, আর নদীর কলকল ধ্বনি চাপা পড়ছে নির্মাণ কাজের যান্ত্রিক শব্দে।

এই উন্নয়নের পেছনে লুকিয়ে আছে হাজারো মানুষের অশ্রু আর জীবিকা হারানোর বেদনা। ২০১৩ সালে পায়রা সমুদ্র বন্দর প্রকল্পের ঘোষণা আসার পর থেকে শুরু হয় জমি অধিগ্রহণের এক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। কোনো জনমত যাচাই ছাড়াই প্রায় ১০ হাজার একর জমি নেওয়া হয়েছে, যার ৬০ শতাংশই ছিল উর্বর কৃষিভূমি। ২৫ শতাংশ জলাভূমি আর ১৫ শতাংশ বসতভিটা ও অন্যান্য অবকাঠামোও পড়েছে এই অধিগ্রহণের কবলে।

> "সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে লালুয়া ও ধানখালী ইউনিয়ন। লালুয়া ইউনিয়নে ২১টি গ্রাম আজ প্রায় বসতি শূন্য। জমি হারিয়ে গৃহহীন হয়েছেন বহু মানুষ। কৃষিকাজই যাদের একমাত্র সম্বল ছিল, তারা আজ জীবিকা হারিয়ে দিশাহীন। অনেক কৃষকই বছরের পর বছর ধরে চাষ করা জমি ছেড়েছেন, কেউ কেউতো পুরোপুরি কৃষিকাজই ছেড়ে দিয়েছেন।"

প্রাকৃতিক পরিবেশও এই উন্নয়নের ছোবল থেকে বাঁচেনি। নদী ও প্রকৃতির ওপর ব্যাপক ধ্বংসাত্মক প্রভাব পড়ছে। ফলে ইলিশসহ অন্যান্য মাছের প্রজনন ব্যাহত হচ্ছে, যা মৎস্যজীবীদের জীবনকেও ঝুঁকিতে ফেলছে। কলাপাড়ায় এখন ৯,৯২৩.২৮ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। আরও ৩০০ একর প্রক্রিয়াধীন। এই উন্নয়ন কলাপাড়াকে সমৃদ্ধ করেছে ঠিকই, কিন্তু এর বিনিময়ে হাজারো মানুষের স্বপ্ন, জীবিকা, এবং পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

কৃষক হায়দার আলীর কান্না

এক সময় ধানখালীর বিস্তীর্ণ মাঠে দাঁড়িয়ে হায়দার আলী দেখতেন, পাকা ধান ঝুঁকে পড়ছে বাতাসে। দূরে দেখা যেত তাঁর গাভি ঘাস খাচ্ছে, পাশে ছোট নাতি পা ভিজিয়ে খেলছে খালের পানিতে। সেই দৃশ্য আজ শুধুই স্মৃতি। এখন সেখানে দাঁড়ালে দেখা যায়, চওড়া সড়ক, ধুলায় ঢেকে থাকা ইট-বালু আর লোহার স্তূপ। মাঝেমধ্যে হুঁইসেলের শব্দে কেঁপে উঠে বাতাস, আর ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আকাশের মুখ। অভিমানী কণ্ঠে হায়দার আলী বলেন, "জমি ছিল। ক্ষেত ছিল। ঘর ছিল। এখন কিছুই নাই।"

তাঁর দুই একর জমি গেছে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে। বিনিময়ে পেয়েছেন এককালীন ক্ষতিপূরণ, যা দিয়ে শহরের উপকণ্ঠে একটা আধা-পাকা ঘর তুলেছেন। কিন্তু জীবিকা ?

এই প্রশ্ন হায়দার আলীর একার নয়। কলাপাড়ার চম্পাপুরের বাসিন্দা মাহফুজুর রহমানের আড়াই একর জমির বেশির ভাগই অধিগ্রহণে নিয়েছে আশুগঞ্জ পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি। ক্ষতিপূরণ বাবদ পাওয়া টাকা ইতোমধ্যে নানা খাতে খরচ হয়েছে। এখন রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা নেই। তিনি বলেন, 'সব শেষ করে আধা কানি (৮০ শতক) জমি অবশিষ্ট আছে। জমিটা পাওয়ার প্লান্টের (বিদ্যুৎ কেন্দ্র) পাশে হওয়ায় আগের মতো ধান হয় না। দেখা যায়, গাছ কুঁকরিয়ে গেছে বা ধানের শিষ ঠিকমতো বের হচ্ছে না। কয়টা কলাগাছ লাগাইছিলাম, কলার ছড়া বের হইছে কিন্তু কলা নাই।

যারা উন্নয়নের নাম শুনেছে, কিন্তু তার আলো পায়নি। ২০১৩ সালে পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় বিদ্যুৎ প্রকল্পের ঘোষণা আসার পর থেকে পাল্টাতে শুরু করে কলাপাড়ার মানুষের জীবন।

হায়দার আলী বলেন, "জমি তো ছিল আমার ব্যাংক, আমার বাঁচার রাস্তা। এখন কই যাই ? আমার নাতি একদিন জানতে চাইবে দাদা, তুমি জমি হারাইলা কেন ? আমি কী বলব তখন ?"

স্বপ্নের পুনর্বাসন, বাস্তবের জটাজাল ঃ ফজলুর রহমানের পরিবারের গল্প

পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলা, যেখানে একসময় দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ফসলের মাঠ ছিল এবং কুয়াকাটার অপার সৌন্দর্য হাতছানি দিত, সেখানে এখন উন্নয়নের এক নতুন ঢেউ এসে লেগেছে। কিন্তু এই উন্নয়নের আড়ালে লুকিয়ে আছে নানা বঞ্চনা ও দুর্ভোগের গল্প। তেমনই এক করুণ গল্পের শিকার লোন্দা গ্রামের বাসিন্দা ফজলুল রহমান খানের পরিবার।

ফজলুল রহমান তার দুই স্ত্রী ও পাঁচ সন্তানকে নিয়ে লোন্দা গ্রামে সুন্দর জীবন কাটাচ্ছিলেন। পটুয়াখালীর ১৩২০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য যখন নিশানবাড়িয়া, ধানখালী, এবং লোন্দা গ্রামের জমি অধিগ্রহণ করা হয়, তখন ফজলুল রহমানের দুটি বসতভিটেসহ কয়েক একর কৃষি জমিও এর আওতায় চলে আসে। সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, গৃহহারা পরিবারগুলোকে পুনর্বাসন করা হবে, তাই ফজলুলের দুই স্ত্রীর নামে মায়া নীড় ও আনন্দ পল্লীতে দুটি ঘর বরাদ্দ হয়।

কিন্তু স্বপ্ন আর বাস্তবতার মধ্যে ফারাক অনেক। ঘরের চাবি হস্তান্তরের দিন ফজলুলের তৃতীয় স্ত্রী মাহমুদাকে জানানো হয় তার নামে বরাদ্দকৃত ঘরটি বাতিল করা হয়েছে। জানা যায়, একই রকম জটিলতার কারণে শুধু ফজলুলের পরিবার নয়, প্রায় অর্ধশত পরিবার তাদের বরাদ্দকৃত ঘর থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ফজলুলের ছেলে শাহীন খান জানান, তাদের দুই মায়ের নামে দুটি আলাদা ঘর বরাদ্দ হওয়ার কথা ছিল, কারণ বাবার দুটি ভিন্ন বসতভিটেতে তারা বাস করতেন। কিন্তু জাতীয় পরিচয়পত্রে তাদের স্বামীর নাম একই হওয়ায় মাত্র একটি ঘর বরাদ্দ করা হয়। এক বছর ধরে তারা জেলা প্রশাসকের দপ্তরে ঘুরেও কোনো সুরাহা পাননি।

অন্যান্য ভুক্তভোগীদের গল্পও একইরকম বেদনার্ত। লোন্দা গ্রামের রাকিব হাওলাদারের পরিবার ৫০ বছর ধরে সরকারি খাস জমিতে বসবাস করলেও তাদের পুনর্বাসনের ঘরটি পেয়েছেন একজন স্থানীয় প্রভাবশালী। অন্যদিকে, আব্বাস সর্দারের বাবা ২০ বছর আগে জমি কিনে বসতভিটা তৈরি করলেও মাঠ জরিপের বিএস পর্চায় অন্য একজনের নাম আসায় তারা ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের ঘর থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

এই পুনর্বাসন প্রকল্পগুলো কলাপাড়ার মানুষের জন্য নতুন জীবনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এলেও, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, ভূমি অধিগ্রহণের ত্রুটিপূর্ণ প্রক্রিয়া এবং স্থানীয় প্রভাবশালীদের ক্ষমতা এই প্রতিশ্রুতিকে ম্লান করে দিয়েছে। ফজলুর রহমানের মতো অসংখ্য পরিবার এখন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি, যেখানে উন্নয়নের আলোয় তাদের জীবন আরো অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। তাদের গল্প কলাপাড়ার উন্নয়নের এক ভিন্ন চিত্র তুলে ধরে, যেখানে অধিকার থেকে বঞ্চিত মানুষের কান্না আজও শোনা যায়।

উন্নয়ন নয়, এ যেন এক সর্বনাশা ফাঁদ

পটুয়াখালীর কলাপাড়া, একসময় যা ছিল সবুজে মোড়া শান্ত জনপদ, আজ তা পরিচিতি পেয়েছে দেশের 'পাওয়ার হাব' হিসেবে। একদিকে মেগা প্রকল্পের বিশাল নির্মাণযজ্ঞ, অন্যদিকে সেই উন্নয়নের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া সহজ সরল মানুষের জীবন। এখানকার দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ফসলের মাঠ ও মাছভরা নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জীবনযাত্রা আজ এক নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি, যেখানে উন্নয়নের লাভ ভোগ করছে একদল মধ্যস্বত্বভোগী।

কলাপাড়ার চান্দুপাড়া গ্রামের জালাল হাওলাদার। পায়রা বন্দরের জন্য তার পৈতৃক বসতবাড়ি ও চাষের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। জীবনের শেষ সম্বলটুকু হারিয়েও জালাল সাহেব আশায় বুক বেঁধেছিলেন অন্তত ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করতে পারবেন। কিন্তু তিনি জানতেন না, এই টাকা প্রাপ্তি তার জন্য কতটা কষ্টের হবে। স্ত্রী মনিরা বেগম জানান, "ক্ষতিপূরণের টাকা কীভাবে পাব, কোন দপ্তরে যেতে হবে, কিছুই আমরা জানতাম না।" ঠিক তখনই তাদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিতে এগিয়ে আসে পার্শ্ববর্তী গ্রামের দুই যুবক, যারা নিজেদের 'সহায়তাকারী' হিসেবে পরিচয় দেয়।

নিরীহ জালাল দম্পতি তাদের বিশ্বাস করে একটি স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করে দেন। দিন, মাস, বছর পেরিয়ে গেলেও টাকার দেখা নেই। হতাশ হয়ে তাদের বড় ছেলে এনামুল হক পটুয়াখালী ডিসি অফিসের অধিগ্রহণ শাখায় যোগাযোগ করলে জানতে পারে, তাদের নামে চেক প্রস্তুত হয়ে আছে। এই খবর ওই দুই যুবক জানতে পেরে এনামুলের কাছে দেড় লাখ টাকা দাবি করে। টাকা দিতে অস্বীকার করায় এনামুলকে মারধর ও প্রাণনাশের হুমকি দেয়। জালাল হাওলাদারের পরিবার তখন নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। বাধ্য হয়ে তারা প্রশাসনের কাছে হস্তক্ষেপ চেয়ে আবেদন করে।

প্রশাসনের তৎপরতায় শাহাদত তালুকদার ও মোস্তাফিজুর রহমান নামের দুই দালালকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু জালাল হাওলাদারের পরিবার এখনো আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। মনিরা বেগম বলেন, " জেল থেকে বের হলে তারা আবার আমাদের কী ক্ষতি করবে, সেই ভয়ে থাকি।"

কলাপাড়ার এই উন্নয়ন যেন এক সর্বনাশা ফাঁদ, যেখানে ভূমিহীন ও প্রান্তিক মানুষগুলো তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দালাল চক্রের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে তাদের জীবন। জালালের গল্প কেবল একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এটি কলাপাড়ার হাজার হাজার ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের এক করুণ প্রতিচ্ছবি। এই মানুষগুলো উন্নয়নের স্বপ্ন দেখতে গিয়ে নিজেদের শেষ আশ্রয়টুকুও হারাতে বসেছে।

উন্নয়নের এক নির্মম উপাখ্যান ঃ দুই বাঁধের মাঝে জীবনের সংগ্রাম

পটুয়াখালীর কলাপাড়া, যার পরিচয় ছিল সবুজ আর শান্তির জনপদ হিসেবে, আজ তার সেই পরিচিতি ম্লান হয়ে আসছে উন্নয়নের জোয়ারে। একসময় এই অঞ্চলের মানুষের জীবন ছিল প্রকৃতির ছন্দে বাঁধা, নদী আর ফসলের মাঠে নির্ভর তাদের জীবিকা। কিন্তু সেই সহজ জীবনের আড়ালে আজ ফুটে উঠেছে এক নতুন এবং কঠিন বাস্তবতা। এই বাস্তবতার এক করুণ প্রতিচ্ছবি দেখা যায় আশুগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্টের দুই বাঁধের মাঝে আটকে পড়া ৩০টি পরিবারের জীবনে।

পটুয়াখালী ১৩২০ মেগাওয়াট সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট, যা আশুগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্ট নামে পরিচিত, তার নির্মাণ কাজের জন্য তৈরি করা হয়েছে বিশাল রিংবাঁধ ও সীমানা প্রাচীর। এর পরেই রয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের মূল বাঁধ। এই দুই বাঁধের মাঝে, একশ থেকে দেড়শ ফুট নিচু জমিতে, মানবেতর জীবন যাপন করছে চালতাবুনিয়া গ্রামের ৩০টি পরিবার। তারা তাদের ভিটেমাটি হারিয়েছে, কিন্তু পায়নি কোনো পুনর্বাসন।

এই দুঃসহ জীবনের কথা বলছিলেন রুহুল আমিন শিকদার, যার জমিও এই প্ল্যান্টের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছে। তিনি জানান, ২০২৩ সালে মাত্র ১৫ দিনের নোটিশে রামনাবাদ নদীর তীরের দেবপুর ও চালতাবুনিয়া গ্রামের ৮৮টি পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়। এর মধ্যে এই ৩০টি পরিবার তাদের ঘরের ক্ষতিপূরণের টাকাও পায়নি। ফিরোজা বেগমের মতো অনেকেই এখন সারা বছর পানির সাথে যুদ্ধ করে। "বছরের ৬ থেকে ৭ মাস ঘরের মেঝেতে কোমর সমান পানি থাকে," তার কথায় উঠে আসে এক ভয়াবহ চিত্র। বাধ্য হয়ে তারা ঘরের ভেতর মাচা তৈরি করে কোনোমতে দিন কাটায়।

ক্ষতিগ্রস্থ রশীদ সিকদার বলেন, "পুনর্বাসন না হওয়া পর্যন্ত মাসে ৫ হাজার টাকা বাসা ভাড়া দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সাড়ে তিন বছরে এক কানাকড়িও পাইনি।"কৃষি জমিগুলো এখন ধু-ধু মরুভূমি। তাই পেশা বদলে মাছ ধরতে নেমেছেন। কিন্তু নদীতে মাছও নেই। কর্মহীন হয়ে পড়া এই মানুষগুলোর চোখেমুখে হতাশা স্পষ্ট।

রাশিদা বেগম, যিনি নদীর পারেই জন্মেছেন, বলেন, "মনের মধ্যে ভয় জমে গেছে, কখন ঝড়-বন্যা-জলোচ্ছাসে ঘরবাড়ি উড়িয়ে নিয়ে যায়।" রিনা বেগমের কথায় উঠে আসে বিশুদ্ধ পানি, পয়ঃনিষ্কাশন এবং বিদ্যুতের অভাবের কথা। রাতের পর রাত কাটাতে হয় অন্ধকারে। এই ৩০টি পরিবার যেন উন্নয়নের চাকার নিচে চাপা পড়া এক করুণ উপাখ্যান। তাদের জীবন এক অনিশ্চয়তার প্রতীক, যেখানে প্রকৃতি ও উন্নয়ন উভয়ই তাদের প্রতিপক্ষ।

লোন্দা গ্রামের কান্না ঃ বাঁধহারা জীবনের গল্প

পটুয়াখালীর কলাপাড়া, যার সৌন্দর্য মুগ্ধ করে সবাইকে, সেখানেও লুকিয়ে আছে কিছু মানুষের নীরব কান্না। টিয়াখালী নদীর কিনারায় জেগে ওঠা পশ্চিম লোন্দা গ্রামের চর। যেখানে প্রায় ২৫০টি পরিবার চার দশক ধরে প্রকৃতির প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে টিকে আছে। এই মানুষগুলোর জীবন যেন জোয়ার-ভাটায় দুলতে থাকা এক ভেলা।

সকাল হলেই এখানে রান্নাঘরের চুলায় জল ঢুকে যায়, স্কুলের পথে জমে ওঠে থৈ থৈ পানি। এই গ্রাম যেন এক জলবন্দী জনপদ। তাদের একমাত্র ভরসা একটি টেকসই বেড়িবাঁধ, যার অভাবে প্রতি বছর শত শত একর তিন ফসলি জমি এক ফসলও দিতে পারে না। কৃষক মোশারফ হাওলাদার বলেন, "আমরা জোয়ার-ভাটায় ডুবি আর ভাসি।" এই কথাগুলো যেন শুধু তার নয়, গ্রামের সব মানুষের প্রাণের কথা।

সম্প্রতি এই গ্রামের বাসিন্দা শফিকুর রহমানের মা সোমের্ত বিবি মারা যান। সেই সময় পুরো গ্রামে জল থই থই করছিল। দাফন ও জানাজার জন্য এক টুকরো উঁচু জমিও খুঁজে পাওয়া যায়নি। বাধ্য হয়ে কলাগাছের ভেলায় করে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে নিয়ে জানাজার নামাজ পড়ানো হয়। তারপর আরও দুই কিলোমিটার দূরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে তাকে দাফন করা হয়। এ ঘটনা যেন তাদের জীবনের এক করুণ চিত্র তুলে ধরে।

পশ্চিম লোন্দার স্কুলপড়ুয়া থেকে শুরু করে অসুস্থ গর্ভবতী নারী, সবার জীবনেই এই বাঁধহীন জীবন এক অভিশাপ। মরিয়ম জাহান মৌরি বলেন, "অমাবস্যা-পূর্ণিমার জোয়ারে সবকিছু ভেসে যায়, তখন ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যেতে পারে না, চুলায় পানি ঢুকে যায়, আর অসুস্থদের হাসপাতালে নেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।" স্বেচ্ছাসেবক হালিমা আয়শার গবেষণা বলছে, এই অঞ্চলের কৃষি উৎপাদন হ্রাস, যাতায়াত ব্যবস্থার সমস্যা, শিশুদের স্কুল বিমুখতা এবং চিকিৎসার অভাব, এইসব কিছুর মূল কারণ একটিই টেকসই বেড়িবাঁধের অভাব।

মুক্তিযোদ্ধা আমিনুল ইসলাম ফকু আক্ষেপ করে বলেন, "আমাদের প্রায় ২০০ একর জমি তলিয়ে থাকে, তিন ফসলি হওয়া সত্ত্বেও আমরা এক ফসলও ফলাতে পারি না।" বছরের পর বছর ধরে তারা সরকারের কাছে আবেদন করছেন, কিন্তু তাদের আবেদন যেন কোনো এক অজানা কারণে চাপা পড়ে যাচ্ছে। পশ্চিম লোন্দার মানুষের জীবন যেন এক অন্তহীন যুদ্ধ, যেখানে তাদের একমাত্র আশা সরকারের সুনজর। এই কান্না কি কখনো থামবে? নাকি উন্নয়নের ঝলমলে আলোর নিচে লোন্দা গ্রামের কান্না চাপা পড়েই থাকবে?

জীবনের স্রোতে ভাসমান ঃ রেশমা বেগমের অনিশ্চিত গল্প

পটুয়াখালী ১৩২০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হয়তো হাজারো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে, কিন্তু রেশমা বেগমের মতো শত শত মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছে। যে জীবন ছিল মাটির সঙ্গে মিশে, নদীর পাড়ে গড়ে উঠেছিল স্বপ্ন, আজ সেই জীবনই ভাসছে অনিশ্চয়তার স্রোতে।

রেশমা বেগম, বয়স ৩৩ বছর, স্বামী মোহাম্মদ আমিন মোল্লা, গ্রাম পশ্চিম লোন্দা, ধানখালী ইউনিয়ন, কলাপাড়া উপজেলা, পটুয়াখালী জেলা, যার নিজের কোনো ভিটেমাটি ছিল না, বাবার বাড়িতেই গড়ে তুলেছিলেন তার ছোট্ট সংসার। স্বামী দিনমজুর, আর তিনি নিজে কৃষিকাজ, সবজি চাষ আর হাঁস-মুরগি পালন করে সংসারকে সচল রাখতেন। বাবা-ভাইদের সাহায্য নিয়ে কোনোমতে জীবন কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের 'উন্নয়ন' সেই শান্তি কেড়ে নিল।

তাদের তিনটি পরিবারের জন্য একটি মাত্র পুনর্বাসনের ঘর দেওয়া হয়েছে, যা শুধু রেশমার বাবার নামে। ফলে বাকি দুই পরিবারকে সামান্য কিছু টাকা দিয়ে উচ্ছেদ করা হয়। এখন তারা নদীর পাড়ে জোয়ার-ভাটার সঙ্গে যুদ্ধ করে কোনোমতে বেঁচে আছেন। নদীভাঙন আর জোয়ারের পানি তাদের জীবনের নিত্যসঙ্গী। যে জীবন ছিল মাটির গভীরে প্রোথিত, আজ তা নদীর পাড়ে এক অস্থায়ী আশ্রয় খুঁজে ফিরছে।

রেশমা বেগমের গল্প শুধু তার একার নয়। এটি এমন শত শত মানুষের গল্প, যাদের জীবন উন্নয়নের চাকার নিচে পিষ্ট হয়েছে। তাদের কান্না, তাদের হারানো স্বপ্ন হয়তো কোনোদিন আলোর মুখ দেখবে না, কিন্তু তাদের এই লড়াই, জীবনের সঙ্গে তাদের এই অবিরাম যুদ্ধ, এক করুণ বাস্তবতা তুলে ধরে।

“তাদের বলা হয়েছিল, জমি-ঘরের তিন গুণ দাম দেওয়া হবে, যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি মিলবে, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হবে। কিন্তু সেই সব প্রতিশ্রুতি ছিল কেবলই কথার কথা। রেশমা বেগমের স্বামী, যিনি একজন নির্মাণ শ্রমিক, সেই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কাজ করার সুযোগ পাননি। ফসলি জমি চলে যাওয়ায় রেশমাও তার কৃষিকাজ হারিয়েছেন। আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের জীবনে নেমে এসেছে চরম দারিদ্র্যতা।”

উন্নয়নের আড়ালে লুকিয়ে থাকা কান্না ঃ হাসানের গল্প

পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলা যেন সবুজের এক শান্ত রাজ্য। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ এবং অপরূপ কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত। এখানকার জীবনযাত্রা প্রকৃতি-ঘনিষ্ঠ, যেখানে নদী ও কৃষিকাজই মানুষের মূল অবলম্বন।

আন্ধার মানিক নদীতীরের দক্ষিণ ইটবাড়িয়ার জিয়া কলোনিতে বসবাসকারী মৎস্যজীবী হাসান এবং তার পরিবারও এই প্রকৃতির দয়ায় বেঁচে ছিল। বাবা জসিম উদ্দিন ও মা আমেনা বেগম, স্ত্রী-সন্তান নিয়ে তার সুন্দর জীবন কেটে যাচ্ছিল রামনাবাদ চ্যানেলে মাছ শিকার করে। তাদের জাল ভর্তি ইলিশ, পোয়া আর কোরাল মাছের সোনালী ঝিলিক ছিল তাদের সংসারের হাসি-খুশি আর সুখের প্রতীক। কিন্তু এই সুখের জীবনে কালো ছায়া নেমে আসে ২০২২ সালে, যখন রামনাবাদ নদীর তীরে পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয়।

বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালুর পর থেকেই বদলে যেতে থাকে হাসানদের জীবন। নদীতে মাছ কমে যেতে থাকে। এক বছর পার হতেই হাসানের জালে আর আগের মতো মাছ ধরা পড়ছিল না। দুই বছরের মধ্যে নৌকা ও জাল কেনার জন্য নেওয়া ঋণ এবং মহাজনদের দাদন শোধ করতে গিয়ে তার প্রায় আড়াই লাখ টাকা দেনা হয়ে যায়। দেনার বোঝায় নুয়ে পড়া হাসান একসময় লোক লজ্জায় গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। তার মা আমেনা বেগমের চোখে আজও সেই রাতের কথা ভেসে ওঠে, যেদিন হাসান কাউকে কিছু না বলে বাড়ি ছেড়েছিল। তার কয়েকদিন পর স্ত্রী আর সন্তানও ঢাকায় চলে যায়, একরকম আত্মগোপনে। আমেনা বেগম বলেন, "বাজান আমার দুই বছর ধরে বাড়িতে আসে না।" তার কথায় উঠে আসে এক অসহায় মায়ের চাপা কান্না।

> স্থানীয় জেলে জাকির হোসেন হাওলাদার জানান, পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হওয়ার পর থেকে আন্ধার মানিক নদীতে মাছের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। এর প্রধান কারণ, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিশোধিত ও অপরিশোধিত বর্জ্য এবং গরম পানি নদীতে মিশে পানিকে দূষিত করছে। এতে মাছের প্রজনন প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে, যার ফলে মাছের বংশবৃদ্ধি কমে গেছে।

জসিমের পরিবার যেন এক প্রতীক। এটি কেবল একটি পরিবারের গল্প নয়, বরং কলাপাড়ার উন্নয়নের আড়ালে লুকিয়ে থাকা শত শত পরিবারের গল্প, যারা তাদের ঐতিহ্যবাহী জীবন ও জীবিকা হারিয়ে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। এই উন্নয়নের ঢেউ তাদের জীবনে সুখের পরিবর্তে দুঃখ আর অনিশ্চয়তা নিয়ে এসেছে।

জমিদার থেকে ভূমিহীন ঃ কালাম মাস্টারের বেদনা

পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া একসময় পরিচিত ছিল সবুজে ঘেরা এক শান্ত জনপদ হিসেবে, যেখানে নদী আর কৃষিক্ষেতই ছিল মানুষের জীবনধারণের মূল উৎস। তবে আধুনিক উন্নয়নের ছোঁয়ায় এই জনপদ এখন 'পাওয়ার হাব' হিসেবে পরিচিত। এই উন্নয়নের আড়ালে লুকিয়ে আছে কালাম মাস্টারের মতো শত শত মানুষের নীরব কান্না।

একসময় কালাম মাস্টার ছিলেন এলাকার অন্যতম ধনাঢ্য পরিবারের সদস্য। তাঁর ২২ একর জমির মধ্যে ৫ একর ছিল বসতভিটা, যেখানে ছিল নানা ধরনের ফল ও বনজ গাছের বাগান। পুকুর ভরা মাছ আর গোয়ালে গরু ছিল, যা তাঁর প্রাচুর্যের প্রতীক ছিল। কিন্তু পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের পর তাঁর জীবন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিশাল চিমনিটি এখন তাঁর পারিবারিক পুকুরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, আর জেনারেটরের ঘরটি বসেছে তাঁর বসতভিটার ওপর।

আজ তিনি পথের ফকির। পরিবার নিয়ে তিনি পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধের ঢালে একটি ঝুপড়ি ঘরে বসবাস করেন। "জমিদার থেকে ভূমিহীন" এই বাক্যটি যেন তাঁর জীবনের করুণ বাস্তবতা তুলে ধরে। দুই ছেলে বেকার, স্ত্রী অসুস্থ, আর সংসার চালানো তাঁর জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে।

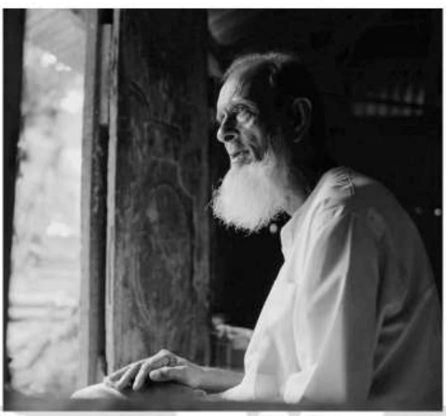

২০১৭ সালে জমি অধিগ্রহণের সময় কালাম মাস্টারসহ ১৩০টি পরিবারকে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। যদিও তারা কিছু টাকা পেয়েছিলেন, কিন্তু জমির ন্যায্য মূল্য এখনো পাননি। পুনর্বাসনের জন্য "স্বপনের ঠিকানায়" ৭ শতাংশ জমির ওপর একটি ঘর পাওয়ার কথা থাকলেও, সেই স্বপ্ন আজও অধরা। কবে সেই ঘর পাবেন, তা কেউ বলতে পারে না।

এলাকার অন্য অনেক ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মতোই কালাম মাস্টারের এই দুর্দশার কারণ উত্তরাধিকার ও আইনি জটিলতা। উত্তর লালুয়া গ্রামের ওলিউর রহমান জানান, জমি অধিগ্রহণের সময় জমির মালিকানা ও ওয়ারিশ নিয়ে নানা ধরনের মামলা-মোকদ্দমা তৈরি হয়। ফলে অনেক পরিবারই আজও ক্ষতিপূরণের টাকা হাতে পায়নি। হালিমা আয়শার মতো স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকরাও এই আইনি জটিলতার কথা স্বীকার করেন, যা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে আরও অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে।

> "কালাম মাস্টারের গল্প কেবল একটি ব্যক্তিগত দুঃখের কাহিনি নয়, বরং উন্নয়নের নামে ভূমিহীন হওয়া হাজারো মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। তাঁর মতো অনেক পরিবারই উন্নয়নের বলি হয়েছেন, যারা তাদের সমৃদ্ধ অতীতকে পেছনে ফেলে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছেন।"

জীবনের বেড়াজালে অনিশ্চিত মিনারা বেগমের জীবন

পটুয়াখালীর কলাপাড়া, এক সময় যার পরিচয় ছিল দিগন্ত জোড়া সবুজে আর অপার সৌন্দর্যের কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে। এখানকার মানুষের জীবন প্রকৃতি ও নদীর সাথে মিশে সহজ সরলভাবে কাটত। কিন্তু এখন এই পরিচিতি বদলে গেছে, কলাপাড়া পরিণত হয়েছে দেশের এক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কেন্দ্রে। উন্নয়নের এই জোয়ারের মাঝে কিছু মানুষের জীবন কতটা অনিশ্চিত, তার জ্বলন্ত উদাহরণ মিনারা বেগমের গল্প।

কলাপাড়ার ইটবাড়িয়া গ্রামে আন্ধারমানিক নদীর পাড়ে অবস্থিত জিয়া কলোনি। এখানেই স্বামী পরিত্যক্তা ৫৫ বছর বয়সী মিনারা বেগম একটি ছোট্ট ঝুপড়ি দোকান চালিয়ে জীবনধারণ করেন। বিশ বছরের বেশি সময় ধরে তিনি এখানেই থাকেন। এক সময় আশ্রিতা হিসেবে অন্যের বাড়িতে থাকা এই নারী নিজের হাতে গড়ে তুলেছেন ছোট্ট একটি সংসার, যা তার কাছে শুধু বাড়ি নয়, ভালোবাসার এক আশ্রয়।

মিনারা বেগম জানান, প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া জমিতে তিনি ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এই বসতভিটা গড়ে তুলেছেন। প্রায় ছয় লাখ টাকা খরচ করে দুটি আধাপাকা ঘর নির্মাণ করেছেন। কিন্তু পায়রা বন্দরের বিকল্প সড়ক নির্মাণের জন্য এই স্বপ্নমাখা বাড়িটি এখন হারানোর পথে। প্রায় এক বছর আগে উচ্ছেদের নোটিশ পেয়েছেন, কিন্তু অনিশ্চয়তার মধ্যে এখনও বেড়িবাঁধের ঢালেই দিন কাটাচ্ছেন। মিনারা বেগম একা নন, তার মতো আরও ১৩৬টি পরিবারের অবস্থা একই। উন্নয়নের নামে তাদের দেওয়া হচ্ছে পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি, কিন্তু তার সাথে নেই কোনো ক্ষতিপূরণ।

মিনারা বলেন, "আমরা গরিব মানুষ, নতুন ঘর তোলার টাকা কোথায় পাব ?" তাকে যে জমি দেওয়া হচ্ছে, তা আন্ধার মানিক নদীর চরের একখন্ড জমি। এটি বছরের ছয় মাস পানির নিচে থাকে, জোয়ারে কোমর সমান পানি ওঠে। ঝড়ের সময় পুরো এলাকা ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। সেখানে বিশুদ্ধ পানি বা বিদ্যুতের কোনো ব্যবস্থা নেই।

মিনারা বেগমের মতো এই কলোনির মানুষজন দিনমজুরি করে এবং মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু মেগা-প্রকল্পগুলোর কারণে তিন ফসলি জমি কমেছে, নদীতে মাছও কমে গেছে। আয় কমে যাওয়ায় অনেক পরিবারকে ঋণের জালে জড়াতে হয়েছে। মিনারার গল্প শুধু একটি পরিবারের দুঃখের কথা নয়, এটি উন্নয়নের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ভূমিহীন ও প্রান্তিক মানুষের অনিশ্চয়তার করুণ চিত্র। তাদের ত্যাগ এবং কষ্ট নিয়ে গড়ে উঠছে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি, অথচ তাদের ভবিষ্যৎ ক্রমেই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

দালালের যাঁতাকলে বন্দী ঃ গৃহহারা মানুষের আর্তনাদ

পটুয়াখালীর কলাপাড়া, যে স্থানটি এক সময় তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সহজ-সরল জীবনের জন্য পরিচিত ছিল, আজ তা উন্নয়নের এক ভিন্ন চিত্র বহন করছে। বিশাল বিশাল অবকাঠামো এবং মেগা-প্রকল্পের জন্য হাজার হাজার মানুষের ভিটেমাটি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু এই উন্নয়নের আড়ালে লুকিয়ে আছে জমি ও ভিটা হারানো মানুষের কান্না আর দালাল চক্রের অমানবিক শোষণের গল্প।

ধানখালী ইউনিয়নের সালমা বেগমের জীবন ছিল সাধারণ, কিন্তু সুন্দর। স্বামী ঢাকার একটি গার্মেন্টসে চাকরি করতেন এবং ৪০ বছরের বসতভিটায় তাদের পরিবার শান্তিতে বসবাস করছিল। কিন্তু কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কারণে তাদের ১২ কাঠা বসতভিটা ও কৃষিজমি অধিগ্রহণ করা হয়। ১৭ লাখ টাকার ক্ষতিপূরণের জন্য স্থানীয় দালাল আজিজুর রহমানকে ৩ লাখ টাকা দিতে বাধ্য হন তারা। সব হারিয়ে আজ তাদের ঠাঁই হয়েছে পুনর্বাসন কেন্দ্রে।

আরেক ভুক্তভোগী আবুল বাশারের গল্পও একই রকম। ১৬ লাখ টাকার ঘরের দাম ধরা হয় মাত্র ৬ লাখ টাকা। কৃষিজমিসহ মোট ১৮ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ তুলতে আতাউল্লাহ নামের এক দালালকে দিতে হয়েছে সাড়ে ৫ লাখ টাকা। জীবনভর কষ্ট করে গড়ে তোলা সব কিছু এক নিমেষে মূল্যহীন হয়ে যায়।

কলাপাড়ার লালুয়া ইউনিয়নে পায়রা সমুদ্র বন্দরের ভূমি অধিগ্রহণে মোসারেফ হাওলাদারসহ অনেক পরিবার আজ মামলা জটিলতায় আটকে আছে। পৈতৃক ভিটেবাড়ি হারিয়ে তারা এখন বেড়িবাঁধের পাশে খুপরি ঘরে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। তাদের অভিযোগ, দালাল চক্র মিথ্যা মামলা দিয়ে তাদের ক্ষতিপূরণের টাকা আটকে রেখেছে।

চম্পা বেগমের পরিস্থিতিও ভিন্ন নয়। নারায়ণগঞ্জে পোশাক কারখানায় কর্মরত স্বামীর সাথে থাকতেন। পরে গ্রামে ফিরে বাবার দেওয়া জমিতে ঘর তুলেছিলেন। পায়রা সমুদ্র বন্দরের জন্য সেই ৪৫ শতাংশ জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। বাড়ির গাছপালা আর পুকুরের জন্য ৬ লাখ টাকা পেলেও, কোনো সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে তাদের ঠাঁই হয়নি। বাধ্য হয়ে রাস্তার পাশে সামান্য জমি কিনে আশ্রয় নিয়েছেন।

এসব ঘটনা শুধু বিচ্ছিন্ন গল্প নয়, এটি কলাপাড়ার উন্নয়নযজ্ঞের এক করুণ বাস্তবতা। যেখানে দালালের সহায়তায় সাজানো মামলা, মিথ্যা অভিযোগ আর আমলাতান্ত্রিক জটিলতার ফাঁদে পড়ে অসংখ্য পরিবার তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। উন্নয়নের আলোয় ঝলসে যাওয়া এই কলাপাড়ায়, গৃহহারা মানুষের আর্তনাদ যেন উন্নয়নেরই এক নিরব সাক্ষ্য।

পায়রা তাপবিদ্যুৎ ঃ জমির লড়াই জীবনের দুর্ভোগ

পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের কারণে পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার অধিবাসী মোঃ অলিউর রহমান (নিপুল) বয়স ৫০ এবং তার মতো আরও অনেক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার আজ মানবেতর জীবন যাপন করছে। প্রায় ৬০ বছর ধরে ভোগদখল করে আসা ১০ একর কৃষি জমি, যা তাদের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন ছিল, তা অধিগ্রহণ করা হয়েছে। তবে জমি অধিগ্রহণের পর থেকেই শুরু হয়েছে মামলা-জটিলতা, যা আজও শেষ হয়নি।

২০১৪ সালে সরকার পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করে। ৭ ধারা নোটিশ জারির পরপরই ভূমিদস্যুরা জাল কাগজপত্র তৈরি করে অলিউর রহমানের জমির উপর মামলা করে। এসব মামলা লড়তে গিয়ে তাকে চাকরি ছেড়ে গ্রামে ফিরে আসতে হয়। দীর্ঘ ৯ বছর ধরে আইনি লড়াই চালিয়ে তিনি ভূমিদস্যুদের বিরুদ্ধে পাল্টা মামলা করেন এবং তাদের কাছ থেকে মুচলেকা আদায় করেন। কিন্তু এত বছর ধরে চলা মামলার কারণে তিনি নিজের জমির ক্ষতিপূরণের টাকা পাননি।

জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ তিনি প্রতি শতকে মাত্র ৫ হাজার ১০০ টাকা পেয়েছেন, যা দিয়ে অন্য জায়গায় জমি কেনা সম্ভব নয়। ফলে তিনি বেকার হয়ে পড়েছেন এবং তার পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণ এবং ছেলেমেয়ের পড়াশোনার খরচ চালাতে পারছেন না।

> “অলিউর রহমান জানান, জমি অধিগ্রহণের সময় তাদের চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি রাখা হয়নি। ফলে এলাকার অনেক কৃষক তাদের জমি হারিয়ে বেকার হয়ে পড়েছেন। এতে সমাজে মাদক ব্যবসা এবং অন্যান্য বেআইনি কার্যকলাপ বেড়েছে।”

বর্তমানে, প্রায় ২৫০ একর জমির মালিক এখনো ক্ষতিপূরণের টাকা পাননি। অলিউর রহমান এবং তার মতো অনেক ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ এখন আশায় দিন গুনছেন, কবে এই লড়াই শেষ হবে এবং তারা তাদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের টাকা পাবেন। তাদের এই লড়াই কেবল জমির টাকার জন্য নয়, বরং সুন্দর সহজ সরল জীবন যাপনের জন্য।

স্বপ্নের ইঁটের দেয়াল ভেঙে

পাপড়ি বেগম, স্বামী সালাম হাওলাদার, গ্রাম পাঁচজুনিয়া, ইউনিয়ন ধানখালী, উপজেলা কলাপাড়া, জেলা পটুয়াখালী। পাপড়ি বেগমের জীবনের গল্পটি যেন একটি অসমাপ্ত কবিতা, যেখানে সুখের পংক্তিগুলো হঠাৎই মুছে গেছে। ১৯৯৮ সাল থেকে শুরু হওয়া এক কঠিন পরিশ্রমের জীবন, যার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল একটি স্বপ্ন নিজের একটি স্থায়ী ঠিকানা। স্বামী-স্ত্রীর নিরন্তর পরিশ্রমে, ঢাকায় গার্মেন্টস ও নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করে, সেই স্বপ্নকে তারা বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন। ২০০২ সালে গ্রামে ফিরে এসে ১৬ শতক জমিতে গড়ে তোলেন সেমি-পাকা টিনের ঘর, একটি ছোট পুকুর আর সবুজে ভরা বাগান। এই ঘর শুধু একটি আশ্রয় ছিল না, এটি ছিল ১৪ বছরের স্বপ্ন, ঘাম আর ভালোবাসার ফসল। সেখানেই তাদের দুই মেয়ের বিয়ে হয়েছে, কেটেছে অনেক সুখের মুহূর্ত।

১২ লাখ টাকারও বেশি খরচ করে গড়া বাড়িটির ক্ষতিপূরণ হিসেবে তারা পেয়েছেন মাত্র ১২ লাখ ৬৯ হাজার টাকা, তাও আবার ঘুষ আর নানান ঝামেলার পর।

আজ সেই পাপড়ি বেগম অন্যের জমিতে একটি টং ঘরে বসবাস করছেন, যেখানে বর্ষায় পানি ওঠে, রান্নার জন্য অন্যের বাড়ি থেকে জল আনতে হয়। অথচ তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল পুনর্বাসন আর কর্মসংস্থানের।

এর চেয়েও বড় বিড়ম্বনা, তারা এখন পর্যন্ত জমির ক্ষতিপূরণের টাকা পাননি। আইনি জটিলতা আর দালালদের দৌরাত্মে তাদের জীবন আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। যেখানে থাকার ঘর নেই, সেখানে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাতো বিলাসিতা। পাপড়ি বেগমের গল্পটি শুধু তার একার নয়, এটি এমন শত শত মানুষের গল্প যারা উন্নয়নের চাকার নিচে পিষ্ট হয়ে আজ বাস্তহীন, অনিশ্চিত জীবনের যাত্রী।

“কিন্তু সেই স্বপ্নের দেয়াল এক ঝটকায় ভেঙে গেল। আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানির জন্য জমি অধিগ্রহণে বুলডোজার মুহূর্তের মধ্যে তাদের সাজানো সংসারকে ধুলোয় মিশিয়ে দিল। পাপড়ি বেগমের কথায়, "ঘর ভাঙার সময়টুকুও দেয়নি, আট-দশটা স্কেভেটর দিয়ে আমাদের সাজানো ঘর মুহুর্তের মধ্যে ভেঙে ফেলা হয়।”

হাওয়া বেগমের লড়াই ঃ উন্নয়নের শিকার এক জীবন

হাওয়া বেগম, যার নামেই আছে জীবনের নতুন সূচনা, আজ সেই হাওয়াই যেন থমকে দাঁড়িয়েছে এক কঠিন বাস্তবতার মুখে। একসময় তিনি ছিলেন একজন উন্নয়নকর্মী, যিনি মানুষের জীবন উন্নয়নের জন্য কাজ করতেন। কিন্তু আজ তিনি নিজেই উন্নয়নের বলি, নিজের হাতে গড়া জীবনের সবকিছু হারিয়েছেন। পেশাগত জীবনে তিনি এখন বেকার, কারণ অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার ফলে উন্নয়ন সংস্থাগুলো ওই এলাকায় তাদের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে।

পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার পশুরবুনিয়া গ্রামের বাসিন্দা হাওয়া বেগম, রামনাবাদ তৃণমূল ভূমি অধিকার দলের দলনেতা হিসেবে কাজ করছেন, কিন্তু নিজের অধিকার আদায়ের জন্য তাকে লড়তে হচ্ছে। তার পৈতৃক সূত্রে পাওয়া ৬০ শতাংশ জমি তিনটি ভিন্ন প্রকল্পের আওতায় পড়েছে। এর মধ্যে পায়রা ১ম টার্মিনাল, পায়রা টার্মিনাল সংযোগ সড়ক এবং সর্বশেষ শের-ই-বাংলা নৌঘাঁটি সম্প্রসারণ প্রকল্প। এই শেষোক্ত প্রকল্পে তার বসতবাড়ি, পুকুর এবং ফসলি জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, যা তার জীবনের সবচেয়ে বড় আঘাত।

দুর্ভাগ্য এখানেই শেষ নয়। জমির মালিকানা নিয়ে আইনি জটিলতার কারণে তিনি এখন পর্যন্ত কোনো ক্ষতি পূরণের টাকা পাননি। তার এক প্রতিবেশী, পুরোনো দলিল দেখিয়ে জমির মালিকানা দাবি করে মামলা করেছেন। অন্যদিকে, তার নিজের চাচা ও ফুফাতো ভাই-বোনদের মধ্যে সম্পত্তির বন্টন নিয়ে মামলা চলায় তার নিজের জমিও আটকে আছে। এসব মামলার কারণে তার জীবন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

> “হাওয়া বেগমের গল্পটি শুধু একটি পরিবারের দুর্দশার গল্পই নয়, এটি এমন শত শত মানুষের গল্প যারা উন্নয়নের নামে তাদের জীবন, জীবিকা এবং স্বপ্ন হারাচ্ছেন। তারা এখনো উচ্ছেদ হননি, কিন্তু তাদের জীবন এখন একটি টং ঘরের মতো নড়বড়ে।”

যে কোনো মুহূর্তে বালুর স্রোতে তা তলিয়ে যেতে পারে। পুনর্বাসনের কোনো আশা নেই, কারণ ফসলি জমির মালিক হওয়ায় তিনি পুনর্বাসনের যোগ্য নন। আর নৌঘাঁটির জন্য যারা বাস্তুচ্যুত হচ্ছেন, তাদের জন্য পুনর্বাসনের কোনো পরিকল্পনাও নেই।

এই গল্পের মূল বার্তা হলো উন্নয়ন সবার জন্য সমানভাবে সুফল বয়ে আনে না। হাওয়া বেগমের মতো মানুষেরা, যারা একসময় নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আজ তারা বিচার এবং অধিকারের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন, আদালতের বারান্দায় তাদের জীবনের শেষ ভরসাটুকু খুঁজে ফিরছেন। তাদের এই লড়াই কেবল জমির টাকার জন্য নয়, বরং সম্মান, জীবিকা এবং বেঁচে থাকার অধিকারের জন্য।

এক কৃষক থেকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ইব্রাহিম সিকদারের অসহায় গল্প

মোঃ ইব্রাহিম সিকদার, এক সময়ের কৃষক, আজ তিনি এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। পটুয়াখালী ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (আরএনপিএল) তার জীবনকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। যে জমিতে তার বাবা চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন, যে বাড়িতে তাদের পরিবারে সুখ-শান্তি ছিল, সেই সবকিছু আজ অধিগ্রহণের কবলে পড়েছে।

ইব্রাহিম সিকদারের পরিবারের পেশা ছিল কৃষিকাজ, মাছ চাষ এবং মাছ শিকার। তাদের নিজস্ব জমি না থাকলেও তার বাবার ৪০ শতাংশ জমিতে তারা একটি ছোট্ট বসতবাড়ি গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু এই সামান্য আশ্রয়টুকুও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের সময় ইব্রাহিম সিকদারের বাড়িটি তালিকাভুক্ত করা হয়নি। তবুও তিনি আশা ছাড়েননি। জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন করে তিনি তার বাড়ি রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কোনো সাড়া না পাওয়ায়, যখন বালু ফেলা শুরু হলো, তখন তিনি ১৭ দিন ধরে তার ঘরের চারপাশে বাঁধ দিয়ে বালির পানি সেচ করে বাড়ি রক্ষা করার চেষ্টা চালিয়ে যান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে বাধ্য হয়ে বাড়ি ছাড়তে হয়। পুলিশ এসে মামলার ভয় দেখিয়ে তাকে তার বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে।

> **ইব্রাহিম সিকদারের জীবনে নেমে আসে এক চরম অনিশ্চয়তা। তার বাবা পুনর্বাসনের জন্য একটি ঘর পেলেও ইব্রাহিম সিকদার এবং তার পরিবারের জন্য কোনো পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেই। কারণ, জমির মালিকানা তার বাবার নামে ছিল। ফলে, নিজেদের বাড়ি এবং পেশা হারিয়ে তারা এখন অসহায়।**

ক্ষতিপূরণের নামে তারা কেবল কিছু গাছের মূল্য পেয়েছে, যা তাদের হারানো জীবনের তুলনায় কিছুই না। যে জমির বাজারমূল্য ছিল প্রতি শতাংশে ১০,০০০ টাকা, অধিগ্রহণের পর তার দাম ধরা হয়েছে মাত্র ৪,১০০ টাকা।

ইব্রাহিম সিকদারের গল্পটি একটি করুণ চিত্র, যেখানে উন্নয়ন মানুষের জীবন, জীবিকা ও অধিকার কেড়ে নেয়। তিনি আজও রামনাবাদ তৃণমূল ভূমি অধিকার দলের দলনেতা হিসেবে কাজ করছেন, বিভিন্ন প্রতিবাদে অংশ নিচ্ছেন, কিন্তু তার নিজের সমস্যাগুলির কোনো সমাধান এখনো হয়নি। তার মতো হাজারো পরিবার আজ উন্নয়নের বলি, যারা শুধু একটি সামান্য আশ্রয় এবং বেঁচে থাকার অধিকারটুকু ফিরে পেতে চায়।

উন্নয়নের আড়ালে চাপা পড়া জীবন ঃ কলাপাড়ার ভূমিহীনদের করুণ গাথা

কলাপাড়ার টিয়াখালী ইউনিয়নের ইটবাড়িয়া গ্রামে, আন্ধার মানিক নদীর পাড়ে বেড়িবাঁধের ঢালে, ১৩৬টি ভূমিহীন পরিবারের জীবন আজ এক করুণ গল্পের মতো। নদীভাঙন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে সব হারিয়ে ২০০৪ সালে সরকারের দেওয়া এই আশ্রয়টুকু ছিল তাদের শেষ ভরসা। মাছ ধরে, দিনমজুরি করে, কোনোমতে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখেছিল তারা। কিন্তু কলাপাড়ায় উন্নয়নের জোয়ার আসার পর থেকেই তাদের জীবনে নেমে আসে সীমাহীন দুর্দশা।

সরকারের কোনো ধরনের সহায়তাতো জোটেইনি, উল্টো তাদের দিন কেটেছে হুমকি আর নিরাপত্তাহীনতায়। ২০২৩ সালে উচ্ছেদের নোটিশ পাওয়ার পর থেকে তাদের নির্ঘুম রাত কাটছে। প্রতিনিয়ত ভয় দেখানো হচ্ছে, যদি স্বেচ্ছায় না সরে যায়, তবে জোর করে তাদের ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া হবে।

> “সেলিনা বেগম, গত ১৮ বছর ধরে এখানেই আছেন। তার টিনশেড ঘরের চাল আর বেড়ায় মরিচা ধরেছে, তবুও এটাই তার শেষ আশ্রয়। অসুস্থ স্বামী আর ৯ সদস্যের সংসারের বোঝা টানতে টানতে তিনি ক্লান্ত। তার ওপর উচ্ছেদের ভয় তাদের জীবনের অবশিষ্ট শান্তিটুকুও কেড়ে নিয়েছে।”

আমেনা বেগম ও জসিম উদ্দিন দম্পতির অবস্থাও একই। নদীর বুকে মাছ ধরে আর ইটভাটায় কাজ করে তাদের সাত সদস্যের সংসার চলে। কিন্তু মাথা গোঁজার একমাত্র ঘরটি হারানোর শঙ্কায় তারা দিশেহারা।

স্থানীয়রা জানান, পায়রা বন্দরের বিকল্প সড়ক নির্মাণ করার জন্য এই ১৩৬ পরিবারকে উচ্ছেদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। বারবার প্রতিবাদ করেও কোনো ফল হয়নি। ইব্রাহীম মিয়া নামের একজন আপে করে বলেন, আমরা যেন এ দেশের নাগরিকই না। গতবার ঘূর্ণিঝড় রিমালের পর সবাই ত্রাণ পেলেও আমরা পাইনি। তিনি আরও জানান, পায়রা বন্দর কর্তৃপ অন্য জায়গায় জমি অধিগ্রহণ করে পাকা ঘর দিয়ে পুনর্বাসন করলেও তাদের খালি হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

ফোরকান হাওলাদার নামে আরেক বাসিন্দা বলেন, "আমরা এমনিতেই ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস আর জোয়ারের পানির সঙ্গে নিত্যদিন লড়াই করে বেঁচে আছি। এরপর যদি মাথা গোঁজার শেষ আশ্রয়টুকুও হারিযয়ে ফেলি, তাহলে আমাদের জীবনধারণ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। কোথায় যাব, কী করব, কিছুই বুঝতে পারছি না।"

এই অসহায় পরিবারগুলোর প্রায় ৫০০ সদস্যের জন্য এখন কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই। উন্নয়নের চাকা দ্রুত গতিতে ঘুরছে, কিন্তু এর নিচে পিষ্ট হচ্ছে এই ভূমিহীন মানুষগুলোর স্বপ্ন আর বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বন।

মামলার জালে হয়রানি ঃ কলাপাড়ার বাস্তুচ্যুত মানুষের গল্প

পটুয়াখালীর কলাপাড়া, একসময় যা ছিল সবুজ ফসলের মাঠ আর নদীর কলকল ধ্বনিতে মুখর, আজ তা মেগা প্রকল্পের ভারে চাপা পড়েছে। সেই উন্নয়নের আড়ালে লুকিয়ে আছে শত শত মানুষের নীরব কান্না। বিশেষ করে পায়রা সমুদ্র বন্দরের ভূমি অধিগ্রহণের ফলে বহু পরিবার তাদের পৈতৃক ভিটেমাটি আর জীবিকার একমাত্র অবলম্বন কৃষি জমি হারিয়েছে। কিন্তু তাদের দুঃখ এখানেই শেষ নয়, বরং এক নতুন দুর্ভোগ মামলার জালে হয়রানি হচ্ছে।

লালুয়া ইউনিয়নের ২১৪ টি পরিবারের গল্প এর জ্বলন্ত উদাহরণ। অধিগ্রহণের পর তাদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের টাকা দালালচক্রের মিথ্যা মামলায় আটকে আছে। চানমিয়া, আকবর ফকির, বাবুল মিয়া, মোসারেফ হাওলাদার, রিমন হাওলাদারের মতো অনেকেই আজ সব হারিয়ে বেড়িবাঁধের বাইরে ঝুপড়ি ঘরে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। তাদের একটাই অভিযোগ দালালরা মিথ্যা মামলা দিয়ে তাদের প্রাপ্য টাকা আটকে রেখেছে।

> “ মুজিবুর রহমানের মতো মানুষেরা তাদের জীবনের স্বপ্ন হারিয়েছেন। ২১.৭৩ একর তিন ফসলি জমির মালিক মুজিবুর রহমান পায়রা বন্দরের জন্য সব দিয়েছেন। সেই জমি থেকে তার বাৎসরিক আয় ছিল লক্ষ লক্ষ টাকা। কিন্তু তার ক্ষতিপূরণের টাকাও আটকে আছে। এক রাখাইন পরিবার তার জমির ওয়ারিশ দাবি করে মামলা করেছে। ”

ফরিদ তালুকদার ও তার পরিবারের ৪০ একর জমি ছিল, যা তিন ফসলি হিসেবে বছরে অনেক টাকা আয় দিত। সরকারের পক্ষ থেকে দেড় গুণ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কথা থাকলেও দালালদের তৎপরতা ও মামলার কারণে সেই টাকা পাচ্ছেন না। বিকল্প আবাসনের আশ্বাসও মেলেনি। তাদের জীবন এখন অনিশ্চিত। কলাপাড়ার এই উন্নয়ন অনেকের জন্য আশীর্বাদ হলেও, এই মানুষগুলোর জন্য তা এক দীর্ঘশ্বাসের কারণ।